বাংলা ব্যাকরণ ঃ প্রাথমিক কথা

ইউনিট ১

প্রস্তাবনা ঃ

ভাষা মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যম, মানুষে-মানুষে বন্ধন ও যোগাযোগের উপায় হল ভাষা। ভাষা মানুষের কর্ম ও চিন্তার, শিক্ষা ও জ্ঞানের, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অবলম্বন। ভাষা ছাড়া মানুষকে ভাবাই যায় না। পৃথিবীর মানবগোষ্ঠীর ভাষা এক নয়। নানান দেশের নানান ভাষা। এক এক জায়গায় এক এক ভাষা গড়ে উঠেছে। সেই স্থানের মানুষের দীর্ঘদিনের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ভাষার গাঁথুনি স্থায়ী রূপ পায়। মানুষ মুখে মুখে ভাষা ব্যবহার করে। তারপর দেখা যায় এই ভাষার মধ্যে রয়েছে কিছু নিয়ম-কানুন। এই নিয়মগুলো বিধিবদ্ধ করে ভাষার মধ্যে শৃঙ্খলা আনার প্রয়োজন রয়েছে।

ভাষার নিয়ম কানুনগুলোকে সূত্রবদ্ধ করার যে বিদ্যা রয়েছে তাকে বলা হয় ব্যাকরণ।

ভাষা সৃষ্টি হয়েছে আগে, তারপর ব্যাকরণ। প্রত্যেক ভাষার ব্যাকরণ আছে, বাংলা ভাষারও আছে।

বাংলা ভাষার ব্যাকরণকে বলা হয় বাংলা ব্যাকরণ।

আমরা সবাই বাংলা ভাষা ব্যবহার করি। সেজন্য বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে জানার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। বাংলা ব্যাকরণ পাঠ বাংলা ভাষার শিক্ষার্থীদের আবশ্যিক কাজ। বাংলা ব্যাকরণে বাংলা ভাষার যাবতীয় প্রসঙ্গ ও নিয়মশৃঙ্খলা আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ১ ঃ ভাষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- ভাষার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।
- ভাষার রূপবৈচিত্র্যের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন।

মানুষ ভাষা বিশিষ্ট প্রাণী। মানুষ তার আবেগ, অনুভূতি ও ভাবনা চিন্তা ভাষায় প্রকাশ করে। ভাষা হল মানুষের মুখ থেকে বের হওয়া অর্থবোধক ধ্বনি-সমষ্টি। ধ্বনি উচ্চারণের সুবিধার জন্য মানুষের শরীরে নানা সহায়ক অঙ্গ আছে। যেমন- ফুসফুস, গলনালি, স্বরতন্ত্রী, মুখগহ্বর, জিহ্বা, দাঁত, ঠোঁট, নাক ইত্যাদি। এগুলোর নাম বাক-প্রত্যঙ্গ।

বাক-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে মানুষ ধ্বনি উচ্চারণ করে এবং কথা বলে।

ধ্বনিতে ধ্বনিতে মিলে হয় শব্দ, আর শব্দে শব্দে মিলে হয় বাক্য। ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য দিয়ে মানুষ কথা বলে। তাহলে মানুষের মুখ থেকে বের হওয়া কথাই হল ভাষা।

ভাষার সাহায্যে এক মানুষ অপর মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করে, তার মনের ভাব প্রকাশ করে, সুখ-সুবিধার কথা জানায়। এভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের সখ্য ও প্রীতি গড়ে ওঠে এবং এভাবে মানুষের সমাজও গঠিত হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে,

মানুষের কথা অর্থাৎ ভাষা, সমাজ গড়ার সব চাইতে জরুরি উপাদান।

মানুষ ভাষা দিয়ে সমাজ তো গড়েই, তা ছাড়া শিক্ষার্থী ও জ্ঞানবিজ্ঞান দর্শনের পথেও অগ্রসর হয়। মানুষ তার মনের নানা স্বপ্ন-কল্পনা ও সূক্ষ্মভাব ভাষায় প্রকাশ করে। এই প্রক্রিয়ায় মানুষ কবিতা, গান, উপাখ্যান, গল্প ইত্যাদি সাহিত্যও তৈরি করে। অর্থাৎ মানুষ যে সভ্য ও সংস্কৃতিবান হয় তার মূলে রয়েছে ভাষা। ভাষা মানুষের সকল অনুভূতি ও জ্ঞানের বাহন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি।

মানুষ অন্যভাবেও মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। যেমন- মাথা নেড়ে, হাতের ইশারায়, চোখের ইংগিতে, শব্দ করে, অর্থাৎ নানা ভঙ্গিতে ও মুদ্রার সাহায্যে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এসব ইশারা ইংগিত ভাষা নয়। ভাষাকে অর্থগ্রাহ্য হতে হয় এবং কথা বলার মধ্যে ভাষা পূর্ণতা পায়। সেজন্য বোবা মানুষের অব্যক্ত ধ্বনি কিংবা পশু-পাখির বিচিত্র ডাক ভাষা নয়; কারণ এগুলো বোধ্য নয়। তাহলে ভাষার সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে এইরূপে–

ভাষার সংজ্ঞা

মনের ভাবচিন্তা ইচ্ছা অনুভূতি উপলব্ধি ইত্যাদি প্রকাশ করার জন্য যখন মানুষ বাগযন্ত্রের সাহায্যে মুখ দিয়ে অর্থগ্রাহ্য ধ্বনি, শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করে তখন তাকে ভাষা বলা হয়।

পৃথিবীর সকল মানুষের ভাষা কিন্তু এক নয়। পৃথিবীতে নানান ভাষা আছে। এক এক অঞ্চলের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ভৌগোলিক আবহ মানুষের ভাষা ভঙ্গিতে পার্থক্য সৃষ্টি করে। সেজন্য এক এক অঞ্চলের এক এক ভাষা। আবার একই ভাষার মধ্যেও দেখা যায় নানা পার্থক্য। ভাষা প্রতি পনর বিশ মাইল অন্তর-অন্তর কিঞ্চিৎ পালটে যায়। উচ্চারণে, কথ্যভঙ্গিতে এবং শব্দ ব্যবহারে পরিবর্তন দেখা যায়। আবার সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গেও ভাষার পরিবর্তন হয়। একশ বছর আগের আর একশ বছর পরের ভাষা এক নয়। সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষের ভাষা গড়ে উঠেছে। প্রাচীন কালে গ্রীক, সংস্কৃত, ল্যাটিন, আবেস্তা ইত্যাদি ভাষা ছিল বিখ্যাত। এই ভাষাগুলো এখন আর প্রচলিত নেই। এগুলো এখন মৃত ভাষা। আধুনিক পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষাগুলোর মধ্যে রয়েছে ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, রুশ, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ, চীনা, জাপানি, আরবি, ফারসি, হিন্দি, বাংলা ইত্যাদি। বর্তমানে ইংরেজি এক নম্বর আন্তর্জাতিক ভাষা। বাংলা ভাষাও ঐতিহ্যমন্ডিত। এই ভাষার রয়েছে সমৃদ্ধ সাহিত্য। বাংলাদেশের, পশ্চিমবঙ্গের, ত্রিপুরার, আসাম, উড়িষ্যা ও বিহারের কিছু অংশের এবং মিয়ানমারের আরাকান অঞ্চলের অধিবাসীরা বাংলাভাষী। বাংলা এখন বিশ্বের নানান জায়গায় ছড়িয়ে গেছে। বৃটেন, আমেরিকা, কানাডা ইত্যাদি অঞ্চলে এখন প্রচুর বাংলা ভাষী অভিবাসী। এরা স্থানীয়ভাবে বাংলা পত্রপত্রিকা ও বই পুস্তক বের করছে; সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্মেলন ইত্যাদিও করছে। সুতরাং বাংলা ভাষার চর্চা হচ্ছে বিদেশ বিভূঁইয়েও। এখন পৃথিবীর বিশ পঁচিশ কোটি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে।

মুখের ভাষা, লেখার ভাষা

মানুষকে ঘরে বাইরে সব জায়গাতে কথা বলতে হয়। ঘরের লোকজনের সঙ্গে সে কথা বলে, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে বলে, পাওনাদারের সঙ্গে বলে, দোকানদারের সঙ্গে বলে। রান্না ঘরে, বৈঠকখানায়, বাজারে-হাটে, রাস্তা-ঘাটে, অফিসে, স্কুলে-কলেজে, বন্ধু বান্ধবদের আড্ডায়, বাস রেল স্টেশনে, চায়ের দোকানে, খেলার মাঠে, পার্কে আরো কত জায়গায় কত প্রয়োজনে মানুষকে কথা বলতে হয়।

মানুষের মুখ থেকে বের হওয়া ভাষা হল মুখের ভাষা।

মুখের ভাষার সাহায্যে এক মানুষ আরেক মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে আদান প্রদান ও ভাব বিনিময় করে। মুখের ভাষা বলা ও শোনার মধ্যে সীমাবদ্ধ, তা স্থায়ী নয়। মুখের ভাষা সহজে হারিয়ে যায়।

ভাষাকে স্থায়ী করার জন্যই লেখার রীতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

লেখার জন্য উচ্চারিত ধ্বনিগুলির প্রতীক রূপের (Symbol) প্রয়োজন। যেমন আমরা যে ধ্বনিকে 'ক' বলে উচ্চারণ করছি তার লেখ্য প্রতীক হল 'ক'। মুখে বলছি 'র', এর লেখ্য রূপ ''র। এইভাবে প্রতীকগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। যেমন– অ, আ, ই, উ, ক, জ, ট, ত, ম, শ, হ ইত্যাদি। প্রায় সব ভাষার এই রকম লেখ্য ধ্বনি প্রতীক আছে, যেমন– ইংরেজি A, B, C, D ইত্যাদি; আরবি ইত্যাদি। এভাবে কোন ভাষাকে লেখ্য রূপ দিতে হলে ধ্বনির প্রতীক রূপ বর্ণ (Letter)থাকতে হবে। বর্ণমালা (alphabets)বলতে বোঝায় সবগুলো বর্ণকে একত্রে। বর্ণের সঙ্গে বর্ণ যুক্ত হয়ে কোন বস্তু, ভাব, ক্রিয়া ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করলে তা হয় শব্দ; শব্দের সঙ্গে শব্দ দিয়ে আমরা বাক্য তৈরি করি। এই শব্দ বা বাক্য ধ্বনি প্রতীকের রূপে লিখিত হতে পারে পায়। তাহলে লেখ্য ভাষা বা লিখিত ভাষা হল, –

ধ্বনি প্রতীকের সাহায্যে লিখিত রূপে পাওয়া ভাষা।

শিষ্ট ভাষা, উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা, সাহিত্যের ভাষা

একটি দেশের শিক্ষিত ও ভদ্রশ্রেণী মানুষের ব্যবহার উপযোগী যে বিশেষ ভাষার প্রচলন রয়েছে তাকে বলা হয় শিষ্ট ভাষা বা মান ভাষা বা প্রমিত ভাষা।

বাংলাদেশের শিক্ষিত মানুষেরা অফিসে আদালতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীকক্ষে কিংবা ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় যে ভাষায় কথা বলে তা শিষ্ট বা মান ভাষা। অন্যদিকে একই ভাষা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মুখে ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ করে। যেমন বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর, ইত্যাদি এলাকার ভাষা যে বাংলা ভাষা তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এগুলোর একটার সঙ্গে আরেকটার পার্থক্য আছে। উচ্চারণের টানটুনে সে পার্থক্য বোঝা যায়। সে জন্য চট্টগ্রামের ভাষা আর সিলেটের ভাষা এক নয়। নোয়াখালির ভাষা আর ঢাকার ভাষা এক নয়। তাহলে আঞ্চলিক ভাষা বলতে বোঝায়, –

কোন দেশের অঞ্চল বিশেষের লোকজনের ব্যবহার্য ভাষা।

কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ও অন্যান্য গদ্য রচনায় যে ভাষা ব্যবহৃত হয় তা সাহিত্যের ভাষা।

সাহিত্যে মানুষের ভাব, চিন্তা, আবেগ, অনুভূতি ও কল্পনার সুন্দর রূপায়ন ঘটে। সেজন্য সাহিত্যের ভাষা হয় মার্জিত ও পরিশীলিত। সব সময় শিষ্ট বা মান ভাষাতে সাহিত্য রচিত হয়। দেশের শিক্ষিত মানুষ সাহিত্যের পাঠক। তাদের জন্যই সাহিত্যে সর্বজনীন মান ভাষার ব্যবহার হয়। তবে বর্তমানে জীবনের নিরেট বাস্তবতা প্রকাশের প্রয়োজনে সাহিত্যে বিশেষ করে গল্পের, উপন্যাসের ও নাটকের চরিত্রের সংলাপে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায়। আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগে সাহিত্য জীবনধর্মী হয়। শুধু বাংলার নয়, পৃথিবীর সব উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক ভাষায় মানরূপ এবং আঞ্চলিক বা স্থানীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ভাষার ব্যবহার রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. 'মানুষ ভাষা বিশিষ্ট প্রাণী' - এ কথা বুঝিয়ে লিখুন।
২. ভাষার কি কি কাজ?
৩. ভাষার সংজ্ঞা দিন।
৪. পৃথিবীতে বহু ভাষার সৃষ্টি হয়েছে কীভাবে?
৫. পৃথিবীর মৃত ভাষাগুলোর নাম লিখুন। আধুনিক ভাষাগুলোরও তালিকা দিন।
৬. কোন কোন অঞ্চলের লোক বাংলায় কথা বলে?
৭. মুখের ভাষা আর লেখার ভাষার পার্থক্য বুঝিয়ে দিন।
৮. শিষ্ট বা মান ভাষা আর আঞ্চলিক ভাষার পার্থক্য বুঝিয়ে দিন।
৯. বাক-প্রত্যঙ্গ কি? কয়েকটি বাক-প্রত্যঙ্গের নাম লিখুন।

উত্তর

প্রশ্ন ঃ 'মানুষ ভাষা বিশিষ্ট প্রাণী' - এ কথা বুঝিয়ে লিখুন।

উত্তর ॥ মানুষ এমন এক ধরনের বিশেষ প্রাণী যার ভাষা আছে। অন্য প্রাণীরও ভাষা আছে মনে করা হয়। যেমন পাখির কিচিরমিচির, বিড়ালের মিউ মিউ, কুকুরের ঘেউ ঘেউ, গরুর হাম্বা ধ্বনি। কিন্তু এই শব্দগুলো একেবারেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ পাখি কিচির মিচির করা ছাড়া আর কিছু করতে পারে না; তেমনি কুকুর ঘেউ ঘেউ কিংবা গরু হাম্বা হাম্বা করা ছাড়া অন্য কোন শব্দ করতে পারে না। তাছাড়া এই শব্দগুলো যে অর্থ বহন করে তাও বোধগম্য নয়। কিন্তু মানুষ তার আবেগ, অনুভূতি, চিন্তাভাবনা, কামনা-বাসনা সবই ভাষায় প্রকাশ করতে পারে। মানুষের ভাষা অর্থপূর্ণ এবং বিচিত্র ভাব প্রকাশক। মানুষের মুখ দিয়ে উচ্চারিত অর্থপূর্ণ ধ্বনি সমষ্টি অর্থাৎ তার কথাই হল তার ভাষা। ভাষা দিয়ে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। এই জন্য বলা হয়েছে 'মানুষ ভাষা বিশিষ্ট প্রাণী'।

প্রশ্ন ঃ ভাষার কি কি কাজ?

উত্তর ॥ ভাষার সাহায্যে মানুষ নিজের মনের ভাব অন্যকে জানায়। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম হল ভাষা। এতে মানুষে মানুষে সম্পর্ক হয়, সম্প্রীতির জন্ম হয়। কার কি সুবিধা বা অসুবিধা তাও জানা যায় ভাষার মাধ্যমে। এভাবে ভাষা মানুষের সমাজ গড়ে তোলে। মানুষের সমাজ গড়ার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান হল ভাষা। সমাজ গড়া ছাড়াও সভ্যতা সংস্কৃতির উন্নতিতে ভাষার প্রয়োজন সর্বাধিক। ভাষার সাহায্যে মানুষ লেখা পড়া শেখে, জ্ঞান-অর্জন করে, সাহিত্য সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন ঃ পৃথিবীতে বহু ভাষার সৃষ্টি হয়েছে কীভাবে?

উত্তর ॥ পৃথিবীতে বহু ভাষার প্রচলন রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, পৃথিবীতে এত ভাষা কেন? পৃথিবীতে বহু মানবগোষ্ঠী আছে এবং তারা পৃথিবীর নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। এক এক জায়গার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন, তাছাড়া নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যও ভিন্ন। এইসব কারণে ভাষার মধ্যেও পার্থক্য সৃষ্টি হয়। বহু দিনের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এক

এক মানবগোষ্ঠীর ভাষা নির্দিষ্ট রূপ পায়। তখন আমরা এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার পার্থক্য সহজে বুঝতে পারি। পৃথিবীতে বহু ভাষার সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের মানুষদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে।

প্রশ্ন ঃ মুখের ভাষা আর লেখার ভাষার পার্থক্য বুঝিয়ে দিন।

উত্তর ॥ মানুষ নানা প্রয়োজনে কথা বলে। মুখ থেকে বের হওয়া এই ভাষা হল মৌখিক ভাষা। মুখের ভাষার সাহায্যে এক মানুষ অন্য মানুষের সঙ্গে সরাসরি ভাবের আদান-প্রদান করে। মুখের ভাষা বলা ও শোনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। মুখের ভাষাকে লেখ্য রূপ দিলে তা হয় লিখিত ভাষা। লেখার জন্য মুখের উচ্চারিত ধ্বনিকে প্রতীক রূপ দেওয়া হয়। যেমন অ, আ, ক, খ ইত্যাদি। এগুলোকে বলা হয় বর্ণ। বর্ণের সঙ্গে বর্ণের যোগে শব্দ হয়, শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি হয়। এইভাবে ধ্বনি প্রতীকের সাহায্যে ভাষা লেখ্য রূপ পায়।

প্রশ্ন ঃ শিষ্ট বা মান ভাষা আর আঞ্চলিক ভাষার পার্থক্য বুঝিয়ে দিন।

উত্তর ॥ দেশের লেখা পড়া জানা লোকজনের ব্যবহার উপযোগী মার্জিত ভাষার নাম শিষ্টভাষা বা মান ভাষা। সাধারণত দেখা যায় দৈনন্দিন আটপৌরে জীবনে মান ভাষার ব্যবহার খুবই কম। এটি দেশের ভদ্র সমাজে প্রচলিত। এই ভাষাকে শিক্ষিত শ্রেণীর সকল মানুষ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের অফিসে আদালতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে ভাষা মৌখিক রূপে ও লেখায় চালু আছে তা-ই মান ভাষা।

অন্যদিকে দেখা যায়, দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে ভাষার রূপ একই রকম নয়। এই ভাষা স্থানীয় বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। সাধারণ ও অশিক্ষিত লোক ঘরে সংসারে, কৃষিক্ষেত্রে, বাজারে হাটে এই ভাষা ব্যবহার করে। অঞ্চল বিশেষের জনসাধারণের ব্যবহৃত এই ভাষা হল আঞ্চলিক ভাষা। যেমন বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, সিলেট, ময়মনসিংহ ইত্যাদি অঞ্চলের ভাষা। এগুলো পৃথক পৃথক আঞ্চলিক বাংলা ভাষা।

প্রশ্ন ঃ বাক প্রত্যঙ্গ কি? কয়েকটি বাক প্রত্যঙ্গের নাম লিখুন।

উত্তর ॥ ঃ 'বাক্' শব্দের অর্থ কথা। কথা মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়। মানবদেহে এমন কিছু অঙ্গ আছে যেগুলির সহায়তায় মানুষ কথা বলতে পারে। এগুলোকে বাকপ্রত্যঙ্গ বলা হয়। যেমন, ফুসফুস, গলনালি, স্বরযন্ত্র, স্বরতন্ত্রী, জিহ্বা, আলজিহ্বা, দাঁত, ঠোঁট, নাক ইত্যাদি। অবশ্য সব ধ্বনি উচ্চারণের জন্য সকল বাকপ্রত্যঙ্গ ব্যবহৃত হয় না।

পাঠ ২ ঃ বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভার

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভার সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাংলা ভাষায় কত রকম শব্দ রয়েছে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভার

বাংলা ভাষায় যত শব্দ রয়েছে সেগুলোকে এক সঙ্গে বলা হয় বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভার।

বাংলা ভাষায় কত শব্দ আছে তা চট করে বলা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বাংলা একটি জীবন্ত ভাষা। সুপ্রাচীন কাল থেকে এই ভাষার যাত্রা শুরু হয়েছে। বহু মানুষ এই ভাষায় কথা বলে। নানা সূত্রে এই ভাষায় বহু মন্দ এসেছে। প্রাচীন মানুষেরা যে সব শব্দ ব্যবহার করত সেগুলো কিছু কিছু এখনো টিকে আছে। তাছাড়া ধর্ম, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইত্যাদি নতুন শব্দ আমদানীতে সাহায্য করে। এভাবে নতুন নতুন শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে। যেমন বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের আগমনের কারণে নামাজ, রোজা, আল্লাহ, মসজিদ, হাজী ইত্যাদি শব্দ আমরা পাচ্ছি। মুসলমান শাসনের সূত্রে পেয়েছি আদালত, মোকদ্দমা, এজলাস, জমি জিরাত, দস্তখত,

কলম, খাজনা, দলিল, দস্তাবেজ ইত্যাদি। ইংরেজরা দীর্ঘদিন আমাদের দেশ শাসন করেছে। শাসনসূত্রে বহু ইংরেজি শব্দ বাংলায় গৃহীত হয়েছে। যেমন স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, কোর্ট, অফিস, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে পেয়েছি রেডিও, টিলিভিশন, টেলিগ্রাফ, কম্পিউটার, বাস, ট্রেন, লঞ্চ, সাইকেল ইত্যাদি। শব্দ একবার চালু হয়ে গেলে তা ভাষার সম্পদ হয়ে ওঠে।

বাংলা ভাষায় যত শব্দ আছে সেগুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

এগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. তৎসম শব্দ

সংস্কৃত থেকে যেসব শব্দ হুবহু বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে সেগুলোকে তৎসম শব্দ বলে।
যেমন- চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, মস্তক, চন্দ্র, গৃহ, পত্র ইত্যাদি।

২. তদ্ভব শব্দ

সংস্কৃত থেকে রূপান্তরিত হয়ে যেসব শব্দ বাংলা শব্দ রূপে পরিচিত হয়েছে সেগুলোকে তদ্ভব শব্দ বলে।

যেমন- চোখ, কাল, হাত, মাথা, চাঁদ, ঘর, পাতা ইত্যাদি।

৩. অর্ধ তৎসম শব্দ

সংস্কৃত থেকে যে সব শব্দ সামান্য পরিবর্তিত বা বিকৃত হয়েছে সেগুলোকে অর্ধতৎসম শব্দ বলা হয়।

যেমন- গিন্নী (গৃহীনী), পুরুত (পুরোহিত), কুচ্ছিৎ (কুৎসিত), কেষ্ট (কৃষ্ণ), জোছনা (জ্যোৎস্না), ছেরাদ্দ (শ্রাদ্ধ)।

৪) দেশী শব্দ

বাংলার আদিবাসীদের ব্যবহৃত যেসব শব্দ বাংলায় রয়ে গেছে সেগুলোকে দেশী শব্দ বলা হয়।

যেমন- মই, ঢেঁকি, কুলা, চাঙ্গারি ইত্যাদি।

৫) বিদেশী শব্দ

ধর্ম, সংস্কৃতি, প্রশাসন, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কারণে বিভিন্ন বিদেশী ভাষা থেকে যে শব্দ সমূহ বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে সেগুলোকে বিদেশী শব্দ বলা হয়।

বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দের মধ্যে আরবি ফারসি ও ইংরেজি শব্দই প্রধান। তবে অন্য ভাষারও কিছু শব্দ বাংলায় রয়েছে। যেমন-

আরবি

ইসলাম, আল্লাহ, রসুল, নবী, হারাম, হালাল, ইমান, হজ্ব, যাকাৎ, মজলিস, ইজ্জত, খেদমত, জাহাজ, জমা, আসল, বাকী, হিসাব, নগদ, আলেম, কলম, হরফ, গোলাম, বাতিল, মৌজা, মহকুমা ইত্যাদি।

ফারসি

দোকান, কারখানা, কাগজ, উকিল, চশমা, জমিদার, দফতর, পর্দা, পায়খানা, সরকার, বালিশ, আয়না, কাছারি, নালিশ, জবানবন্দী, রুমাল, সিপাহী, পোশাক, পায়জামা, দস্তখত, তারিখ, সাল, মেথর, খাজনা।

ইংরেজি

পুলিশ, ব্যাংক, ব্যাগ, মাস্টার, কলেজ, স্কুল, অফিস, হাসপাতাল, বোমা, মেশিন, শেয়ার, ট্রেন, ট্রাম, প্রফেসর, বোতল, কেতলি, কাপ, প্লেট, প্লেন, টিকিট, হেডমাস্টার।

পর্তুগিজ

আলমারি, আলপিন, জানালা, বোতাম, চাবি, আনারস, পেরেক ইত্যাদি।

ফরাসি

রেস্তোরাঁ, ডিপো, আঁতাত, কুপন ইত্যাদি।

ওলন্দাজ

টেক্কা, তুরুপ, হরতন, রুইতন ইত্যাদি।

তুর্কী

দারোগা, চাকর

গুজরাটি

হরতাল

জাপানি

রিকশা

বর্মী

লুঙ্গি

চীনা

চা, চিনি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

পাঠটি পড়ে আপনি প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন

১. বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভার বলতে কী বোঝায়?

২. বাংলা ভাষার শব্দ কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের তিনটি করে উদাহরণ দিন।

৩. নিম্নবর্ণিত শব্দগুলো কোন্ কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত তা লিখুন ঃ

সম্রাট, বক্ষ, কুরবানী, হাকিম, মজবুত, ব্লেড, বাস, ডিপো, গুদাম, আনারস, চিনি, লুঙ্গি, জাহাজ, বাঁদী, পর্দা, সাল, সুইচ, হল, ফটো, রুমাল, জবাই, ফরিয়াদী, জাহান্নাম, কিয়ামত, রিকশা।

বাংলা গদ্যরীতি ঃ সাধু ও চলিতভাষা

ইউনিট ২

ভূমিকা

পৃথিবীর সকল ভাষাতেই গদ্যের আবির্ভাব ঘটেছে পদ্যের অনেক পরে; পদ্যেই রচিত হয়েছে প্রাচীনতম সাহিত্যগুলো। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। একটি আনুমানিক হিসাব করে বলা যাবে, বাংলা কবিতার বয়স যদি হয় দেড় হাজার বছর তবে বাংলা গদ্যের বয়স মাত্র শ'দুয়েক বছর। সমগ্র মধ্যযুগের (১২০১-১৮০০ পর্যন্ত) বাংলা সাহিত্যে গদ্যের যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তা পরিমাণে খুবই সামান্য; তাও সীমাবদ্ধ ছিল দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র রচনার মধ্যে। সেদিক থেকে বলা যায়, বাংলা সাহিত্যে গদ্যের সূত্রপাত আধুনিক যুগে (১৮০১- বর্তমান কাল অবধি)। এদেশে ইংরেজদের আগমনের পর কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ(প্রতিষ্ঠা ১৮০০ সাল)কে কেন্দ্র করে বাংলা গদ্য চর্চা বেগবান হয়। আগেই বলেছি, এর আগে বাংলা গদ্যের ব্যবহার ছিল কিঞ্চিৎ পরিমাণে এবং সীমিত পরিসরে। এ থেকে মনে করার কোন কারণ নেই, প্রাচীন বা মধ্যযুগের লোকেরা বুঝি বা কথাবার্তা বলতো পদ্যে; ছন্দ মিলিয়ে মিলিয়ে। আসলে কথাবার্তার ক্ষেত্রে কোনদিনই কেউ কবিতা ব্যবহার করতো না, বলতো গদ্যেই, এখনও যেমন আমরা বলি। কিন্তু তারপরও সাহিত্য রচনার জন্য দীর্ঘকাল ব্যবহৃত হয়েছে কবিতা বা কবিতার ভঙ্গি।

আধুনিক কালে উদ্ভূত বাংলা গদ্যে লক্ষ করা যায় দু'টো রীতি- একটি কথা বলার রীতি- যাকে বলা হয় মৌখিক রূপ বা কথ্যরূপ; অন্যটি লেখার রীতি- যাকে বলা হয় লৈখিক রূপ বা লেখ্য রূপ। পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষারই রয়েছে এমন দুটো রূপ। সাধারণ কথাবার্তা যখন মানুষেরা বলে তখন ভাষা ব্যাকরণের আঁটো-সাঁটো বন্ধনের অনেক বাইরে থাকে অর্থাৎ ব্যাকরণ তখন কড়াকড়িভাবে আরোপ করা হয় না, ভাষীরা আরোপ করেন না– ভাব প্রকাশ করাই সেখানে মুখ্য। কিন্তু লৈখিক রূপ বা লেখ্য রূপ অনেক বেশি সুনির্দিষ্ট বা সুনিয়ন্ত্রিত। বাংলা ভাষার মৌখিক রূপের রয়েছে আবার দুটো রীতি : একটা সর্বজন স্বীকৃত শিষ্টজন কথিত আদর্শ চলিত ভাষা (Standard Colloquial Language), বা আদর্শ চলিত রীতি (Standard Colloquial Style), অপরটি আঞ্চলিক কথ্য উপভাষা (Local Colloquial Style)। লৈখিক রূপ বা লেখ্যরূপেরও রয়েছে দুটো রীতি : একটি আদর্শ চলিত রীতি (Standard Colloquial Style) অপরটি সর্বজন স্বীকৃত লেখ্যরূপ বা সাধুরীতি (Standard Written Form) বাংলা গদ্যের উল্লিখিত বৈচিত্র্য নিচের চিত্রের সাহায্যে দেখানো যায় :

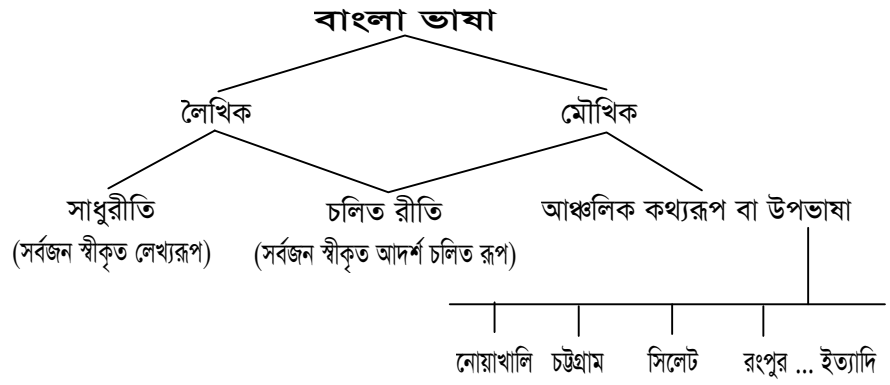

পাঠ ১ ঃ সাধু ও চলিত ভাষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- সাধু ও চলিত ভাষা কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- ঐ ভাষারীতি দুটোর বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে পারবেন।

কাকে বলবো সাধুভাষা?

যতদূর জানা যায় 'সাধুভাষা' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি ১৮১৫ সালে 'বেদান্ত গ্রন্থ' নামে একটি রচনায় প্রথম ঐ শব্দটি ব্যবহার করেন। কিন্তু সাধুভাষা বলতে তিনি বিশেষ কোন্ ধরনের ভাষারীতিকে বুঝিয়েছিলেন তা ারষ্ট নয়। তবে এ-টুকু বোঝা যায় যাঁরা 'সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন' তাঁদের ভাষাকে বোঝাতে তিনি ব্যবহার করেছিলেন সাধুভাষা শব্দটি। অর্থাৎ উনিশ শতকের গোড়ার দিকে যাঁদের ভাষা ছিল 'সংস্কৃতমূলক' ও 'সংস্কৃতানুসারী' তাঁদের ভাষাকেই রামমোহন চিহ্নিত করেছিলেন সাধুভাষা বলে। সাধুভাষার বিপরীতে এখন যে 'চলিত' বা 'চলতি' ভাষার কথা আমরা বলছি, রামমোহনের বেশ পরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালা ভাষা' নামে একটি প্রবন্ধে সে বিষয়ের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "কিছুকাল পূর্বে দুইটি পৃথক ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধু ভাষা; অপরটির নাম অপরভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা। ... সাধুভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ সকল বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের আদিম রূপের সঙ্গে সংযুক্ত হইত। যে শব্দ অভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধুভাষায় প্রবেশ করিবার তাহার কোন অধিকার ছিল না।" বঙ্কিমচন্দ্র ঐ প্রবন্ধে তৎকালীন সাধুভাষাকে আক্রমণ করে বলেছিলেন 'সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা'র কারণেই বাংলা সাহিত্য 'অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল হয়ে উঠেছে। তাই তাঁর পরামর্শ, 'অকারণে ঘর শব্দের পরিবর্তে গৃহ, অকারণে মাথার পরিবর্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্তে পত্র এবং তামার পরিবর্তে তাম্র ব্যবহার উচিত নহে।' সাধুভাষা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঐ সব মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, উনিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত সাধুভাষার যে সুনির্ধারিত রূপ গড়ে উঠেছিল তাতে তদ্ভব, অর্ধতৎসম প্রভৃতি শব্দের তুলনায় তৎসম শব্দের প্রয়োগ ছিল বেশি। তবে বিদ্যাসাগর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের রচনার মধ্য দিয়ে সাধুভাষা ক্রমে সংস্কৃতের গন্ডী বা সংস্কৃত ভাষারীতির অপ্রয়োজনীয় বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে ভাষায় তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্ম রচনা করেছেন তাকে আজ আমরা নিঃসন্দেহে সাধুভাষা বলে চিহ্নিত করি। কিন্তু তিনি তাঁর শেষ দিককার উপন্যাসগুলোয়, আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) এবং সীতারাম(১৮৮৬) এ যে সাধুভাষা ব্যবহার করেছিলেন তা ক্রিয়াপদের আদিম রূপ ছাড়া অনেকখানিই বর্তমানের চলিত বাংলার পূর্বসুরী হবার যোগ্য।

তবে সাধুভাষা বাংলাভাষীদের মুখের ভাষা অনেক কাছাকাছি চলে আসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাধু গদ্যরীতির মাধ্যমে। তিনি ১৯১৪ সালের আগে চলিত ভাষা ব্যবহার করেননি একথা তথ্য হিসেবে সত্য হলেও চলিত বাংলা বা কথ্য বাংলার অনেক কাছাকাছি এসে গিয়েছিল তাঁর গদ্যভঙ্গি। ক্রিয়াপদের ও সর্বনামের আদিম রূপ হয়তো রবীন্দ্রনাথের ১৯১৪ সালের আগেকার গদ্যে ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু তার প্রকাশভঙ্গি অনেক বেশী চলিত বাংলার নিকটবর্তী। ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, **উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের রীতি প্রতিষ্ঠার সময় বাংলা সাহিত্যিক গদ্য অবলম্বন করেছিল সংস্কৃত ভাষার আদর্শ অর্থাৎ সংস্কৃত রীতির শব্দ চয়ন, সমাস-বাহুল্য, কথ্য ভাষার পদ বর্জন রীতি। ঐ শতাব্দীর পণ্ডিতেরাই এ ধরনের ভাষা রীতির নাম দিয়েছিলেন সাধুভাষা।** এখানে বলে রাখা দরকার যে সাধু ভাষা কখনোই মানুষের কথাবর্তার ভাষা ছিল না, এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল কেবল সাহিত্য রচনার মধ্যেই।

কাকে বলে চলিত ভাষা?

চলিত বাংলা গদ্যরীতির প্রথম উদ্যোক্তা হিসেবে যার নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন তিনি শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়। বয়সের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমসাময়িক। বাংলা সাধু গদ্যরীতির আঁটোসাঁটো বন্ধন থেকে ভাষাকে সহজ স্বাভাবিক করে তোলার বাসনায় তিনি 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি প্রস্তাব করেন যে- ১. বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ রাখার প্রয়োজন নেই; ২. বহুবচনে- গণ প্রত্যয় বাংলা ভাষার পক্ষে স্বাভাবিক নয়; ৩. বাংলায় অযথা সন্ধির ভার বাক্যের পক্ষে ক্ষতিকর; ৪. অবিকৃত সংস্কৃত (অর্থাৎ তৎসম) শব্দের তুলনায় রূপান্তরিত (অর্থাৎ তদ্ভব) এবং দেশজ শব্দের ব্যবহারই বাংলায় স্বাভাবিক। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এসব প্রস্তাবে, তাঁর কালের তুলনায়, অনেক বেশি আধুনিক চিন্তার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত চলিত বাংলার সঙ্গে সাধু বাংলার প্রধান যে পার্থক্য অর্থাৎ সর্বনাম পদের ও ক্রিয়াপদের, সে সম্পর্কে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কোন প্রস্তাব নেই। তারপরও বলা যায়, শ্যামাচরণের ঐ প্রস্তাবসমূহ চলিত বাংলা প্রবর্তনে বা ভাষাকে, সরল ও সাবলীল করে তোলার আন্দোলন বেগবান করেছিল।

'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসের লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর লেখায় তৎকালীন কলিকাতার সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাকে সাহিত্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে প্যারীচাঁদের ঐ ভাষাভঙ্গি অন্যদের দ্বারা অনুসৃত হয়ে বিকাশ লাভ করেনি; এমনকি প্যারীচাঁদ মিত্র নিজেও সে ভাষাভঙ্গি পরিত্যাগ করেছিলেন। হয়তো এর অন্যতম কারন, সমকালের মানুষের সাহিত্য রুচির সঙ্গে 'আলালের ঘরের দুলাল'- এর ভাষার খুব বেশি ঐক্য সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। ফলে 'আলালীভাষা'র অকাল মৃত্যু ঘটে।

বর্তমানে যাকে আমরা চলিত বাংলা ভাষা বলে চিনি তার প্রবর্তনের ও প্রয়োগের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে প্রমথ চৌধুরীর বিপ্লবাত্মক পদক্ষেপের জন্য। ১৯১৪ সালে 'সবুজপত্র' নামে একটি উঁচুমানের পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন তিনি। ঐ পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই চলিত বাংলার প্রায়োগিক প্রকাশ ঘটতে থাকে। প্রমথ চৌধুরীর এ প্রচেষ্টা খুব সহজসাধ্য ছিল না কিন্তু অসীম সাহসিকতায় চলিত বাংলার পক্ষে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেনাপতির ভূমিকায়। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'কথার কথা' (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯), 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু বাংলা ওরফে সাধুভাষা' (পৌষ ১৩১৯), 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' (চৈত্র ১৩১৯), আমাদের ভাষা সংকট (১৩২৯) প্রভৃতি প্রবন্ধের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'কথার কথা' প্রবন্ধে বলেছেন, 'আমার ইচ্ছে বাংলা সাহিত্য বাংলা ভাষাতেই লেখা হয়।' তার কারণ স্বাধীন হয়ে, স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টাতেও সুখ আছে। সংস্কৃতের মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে বা সংস্কৃতের 'অঞ্চল ধরে বেড়ানো'তে বাংলা ভাষার কোন কল্যাণ নেই। তারপর তিনি প্রশ্ন করেছেন, কাকে বলে বাংলা ভাষা? উত্তর দিচ্ছেন এভাবে, 'যে ভাষা আমরা সকলে জানি শুনি বুঝি যে ভাষায় ভাবনা চিন্তা সুখ-দুঃখ বিনা আয়াসে বিনা ক্লেশে বহুকাল হতে প্রকাশ করে আসছি, এবং সম্ভবত আরো বহুকাল পর্যন্ত প্রকাশ করব, সেই ভাষাই বাংলা ভাষা। তাই চলিত বাংলার প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর মতামত হচ্ছে, আসল কথাটা কি এই নয় যে, লিখিত ভাষায় আর মুখের ভাষায় মূলে কোনো প্রভেদ নেই। ভাষা দুয়েরই এক, শুধু প্রকাশের উপায় ভিন্ন। একদিকে স্বরের সাহায্যে অপরদিকে অক্ষরের সাহায্যে। বাণীর বসতি রসনায়। শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। **যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়। ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে নয়। উল্টোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে।'** চলিত বাংলা সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী এই মানসিকতা ও সবুজপত্রকে কেন্দ্র করে তাঁর কুশলতায় আধুনিক বাংলায় চলিত গদ্যরীতি বিকশিত হবার সুযোগ পেয়েছে। তা ছাড়া প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে সব সময় ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অকুণ্ঠ সমর্থন। ফলে প্রমথ চৌধুরীর প্রচেষ্টা এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগ্রহ ও পৃষ্টপোষকতায় বাংলা গদ্যে চলিত রীতি আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। স্বাভাবিক কারণে পিছিয়ে পড়েছে সাধুভাষা এবং সম্প্রতি তা সম্পূর্ণ বর্জিত হবারও সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন।

১। পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষার প্রাচীন সাহিত্যগুলো রচিত হয়েছে–
ক) গদ্যে খ) পদ্যে
গ) গদ্য ও পদ্য মিলিয়ে ঘ) কোনটিই নয়

২। মধ্যযুগে বাংলা গদ্যের যে নমুনা পাওয়া গেছে তা সীমাবদ্ধ–
ক) উপন্যাস ও ছোটগল্পে খ) প্রবন্ধ ও উপন্যাসে
গ) নাটক ও চিঠিপত্রে ঘ) দলিল দস্তাবেজ ও চিঠিপত্রে

৩। কোন কলেজকে কেন্দ্র করে বাংলা গদ্য চর্চা বেগবান হয়?
ক) হিন্দু কলেজ খ) সংস্কৃত কলেজ
গ) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ঘ) বেথুন কলেজ

৪। আধুনিক বাংলা গদ্যে কোন দুটি রূপ লক্ষ করা যায়?
ক) মৌখিক ও লৈখিক খ) বাচনিক ও প্রায়োগিক
গ) ব্যবহারিক ও অব্যবহারিক ঘ) লৌকিক মৌখিক

৫। ভাষার মৌখিক রূপে কড়াকড়িভাবে আরোপ করা হয় না–
ক) শব্দচয়ন খ) বাক্যগঠন
গ) সমাস ঘ) ব্যাকরণ

৬। 'সাধুভাষা' শব্দটি প্রথম কে ব্যবহার করেন?
ক) রাজা রামমোহন রায় খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭। সাধুভাষা কখন মানুষের মুখের ভাষা ছিল?
ক) প্রাচীন যুগে খ) মধ্যযুগে
গ) আধুনিক যুগে ঘ) কখনোই না।

৮। বাংলা চলতি গদ্যরীতির প্রথম উদ্যোক্তা কে?
ক) প্যারীচাঁদ মিত্র খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ) রামমোহন রায় ঘ) শ্যামাচরণ গঙ্গোপধ্যায়

৯। মুখের ভাষাকে সাহিত্যের মর্যাদা প্রথম কে দিয়েছিলেন?
ক) শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় খ) প্যারীচাঁদ মিত্র
গ) প্রমথ চৌধুরী ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০। বর্তমানে প্রচলিত বাংলা প্রবর্তনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কে পালন করেন?
ক) প্রমথ চৌধুরী খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ) প্যারীচাঁদ মিত্র ঘ) রামমোহন রায়

সঠিক উত্তর

১। খ ২। ঘ ৩। গ ৪। ক ৫। ঘ ৬। ক ৭। ঘ ৮। ঘ ৯। খ ১০। ক

পাঠ ২ ঃ সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন।
- সাধু থেকে চলিত বা চলিত থেকে সাধুরীতিতে রূপান্তর করতে পারবেন।

সাধু ও চলিত ভাষা

সাধু ও চলিত ভাষার মধে যে দ্বন্দ্ব ও জটিলতা তৈরি হয়েছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বিশ শতকের শুরুতে তার গ্রহণযোগ্য মীমাংসা আমরা লাভ করেছি। সাধু ও চলিত ভাষারীতির প্রধান পার্থক্য নির্ভরশীল সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ওপর। সাধু ভাষারীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পূর্ণ ও দীর্ঘরূপ ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরের চলিত বাংলায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত বা হ্রস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। নিচে ঐ পদ দুটি সাধু ও চলিত রীতিতে ব্যবহারে ক্ষেত্রে কি পার্থক্য ঘটে তা দেখানো হল :

সর্বনাম		ক্রিয়া	
সাধুভাষা	**চলিত ভাষা**	**সাধুভাষা**	**চলিত**
তাহারা, তাঁহারা	তারা, তাঁরা	যাইতেছে	যাচ্ছে
তাহাদের,	তাদের	যাইতেছি	যাচ্ছি
তাহাদিগের	তাদের	গিয়াছেন	গিয়েছেন
তাহাদিগকে	তাদেরকে	যাইবেন	যাবেন
উহাদিগকে	ওদেরকে	লিখিবেন	লিখবেন
কাহারা	কারা	দিয়াছিল	দিয়েছিল
সেইগুলির	সেগুলোর	দিবেন	দেবেন
যাহারা, যাহাদিগের	যারা, যাদের	উঠিতেছিস	উঠছিস
উহা	ওটা	উঠিবেন	উঠবেন
ইহা	এটা ইত্যাদি	শুইয়াছিলাম	শুয়েছিলাম ইত্যাদি

একথা সত্য যে সাধু ও চলিত ভাষার সম্পর্ক যত সহজ ও সমান্তরাল মনে করা হয়, তা তেমন সহজ ও সমান্তরাল নয়। বাংলা বাক্যে অনেক ক্ষেত্রেই যেহেতু ক্রিয়াপদ উহ্য বা অনুক্ত থাকে তাই বিচ্ছিন্নভাবে একটি বাক্য দেখে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না ঐ বাক্যটি সাধু বা চলিত রীতির। নিচের বাক্যগুলো লক্ষ করুন :

ক. মুনমুনের এখন বাড়ি ফেরা উচিত।

খ. দূরের পথ, যত দ্রুত ফেরা যায় ততই ভাল।

গ. মুনমুনের বাড়ি ঢাকার এক প্রান্তে।

ওপরের তিনটি বাক্যকে তাদের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে বলা প্রায় অসম্ভব যে বাক্যগুলো সাধু নাকি চলিত বাংলার অন্তর্গত। এর প্রধান কারণ বাক্যে যদি সমাপিকা ক্রিয়া উহ্য থাকে অর্থাৎ অনুক্ত থাকে তবে সাধু চলিতের পার্থক্য নিরূপণ করা প্রায় অসম্ভব।

আবার কোন কোন বাক্যে ক্রিয়াপদ অনুক্ত না হলেও তার সাধু চলিতের গোত্র নিরূপণ দুরূহ। যেমন নিত্য বর্তমান বা বর্তমান অনুজ্ঞায় কিছু কিছু ক্রিয়াপদের রূপ একবচন ও বহুবচনে এবং সাধু ও চলিত অভিন্ন। উদাহরণগুলো লক্ষ করুন :

আমি/আমরা শুই
তুমি/তোমরা শোও
সে/তারা শোয়

কিন্তু নিত্য বর্তমান ও বর্তমান অনুজ্ঞা ছাড়া অন্যকালের ক্রিয়ারূপে সাধু ও চলিতের পার্থক্য ারষ্ট। যেমন–

সাধু রূপ	**চলিত রূপ**
আমি/আমরা শুইলাম	আমি/আমরা শুলাম
তুমি/তোমরা শুইলে	তুমি/তোমরা শুলে
সে/তারা শুইল	সে/তারা শুল .... ইত্যাদি।

সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য নিয়ে চলিত ভাষার প্রধান সেনাপতি প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধু ভাষা' ও 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' প্রবন্ধ দুটিতে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন। আমরা এখন সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর মতামতের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করছি। তাঁর মতে, 'লেখার ভাষা শুধু মুখের ভাষার প্রতিনিধি মাত্র'। তাই মুখের ভাষার সঙ্গে লেখার ভাষার কোন পার্থক্য থাকা অনুচিত। 'একমাত্র সেই ভাষা অবলম্বন করেই আমরা সাহিত্যকে সজীব করে তুলতে পারব। যেমন একটি প্রদীপ থেকে অপর একটি প্রদীপ ধরাতে হলে পরস্পরের স্পর্শ ব্যতিরেকে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, তেমনি লেখার ভাষাতেও প্রাণ সঞ্চার করতে হলে মুখের ভাষার সম্পর্ক ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। তবে লিখিত ও কথিত ভাষার মধ্যে যে সামান্য পার্থক্য সব সময়ই লক্ষ করা যায় 'সে পার্থক্য ভাষাগত নয়, স্টাইলগত'। সংস্কৃতের অনুসরণে উনিশ শতকে যে ভাষারীতি গড়ে উঠেছিল প্রমথ চৌধুরী তাকে বলেছেন, 'কবিরাজ বিনিন্দিত মন্দগতি'। ফলে সাধুভাষার গড়নটি হয়ে ওঠে 'চলৎশক্তি রহিত'। 'ভাষার এই আড়ষ্ট ভাবটাই সাধুতার একটা লক্ষণ বলে পরিচিত। তাই বাংলা সাহিত্যে সাধারণ লেখকদের গদ্য গদাই লশ্করি ভাবে চলে, এবং কুলেখকদের হাতের লেখা একটা জড় পদার্থের স্তূপমাত্র হয়ে থাকে। এই জড়তার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, লেখাতেও মৌখিক ভাষার সহজ ভঙ্গিটি রক্ষা করা।' প্রমথ চৌধুরী মৌখিক ভাষার সহজ ভঙ্গিটিকেই চলিত বাংলার আদর্শ হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন নদীয়া-শান্তিপুর এবং ভাগীরথির উভয় তীরের ডায়ালেক্ট বা উপভাষাকে। তিনি পূর্ববাংলার কিংবা কলিকাতার উচ্চারণকে প্রমিত বলে গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে, 'ঢাকাই কথা এবং খাস-কলকাত্তাই কথা, অর্থাৎ সুতানুটির গ্রাম্যভাষা, দুয়েরই উচ্চারণ অনেকটা বিকৃত। ....পূর্ববঙ্গের লোকের মুখে স্বরবর্ণ ছড়িয়ে যায়, কলকাতার লোকের মুখে স্বরবর্ণ জড়িয়ে যায়।' এসব কারণেই নদীয়া শান্তিপুর অঞ্চলের ডায়ালেক্টেই তিনি প্রমিত মনে করেছিলেন এবং বর্তমানে প্রচলিত চলিত ভাষা প্রমথ চৌধুরীর আদর্শ অনুসরণ করেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

সাধু ও চলিত ভাষার অন্যান্য পার্থক্য

ক. ধ্বনি তাত্ত্বিক পার্থক্য

মৌখিক উচ্চারণই চলিত ভাষার ভিত্তি। কিন্তু চলিত ভাষার লিখিতরূপে উচ্চারণের মৌখিক বিকৃতিকে অনুসরণ করা হয় না। যে সব শব্দের মৌখিক উচ্চারণ চলিত ভাষার লিখিত রূপের সঙ্গে হুবহু এক নয় তেমন কিছু উদাহরণ নিচে দেয়া হল ঃ

সাধুরূপ	চলিত রূপ	মৌখিক উচ্চারণ	চলিত লিখিত রূপ
দেখিয়া	দেখে	দ্যাখে	দেখে
ফেলিয়া	ফেলে	ফ্যালে	ফেলে

খ. নাম পদের পার্থক্য

নাম শব্দের বচনভেদ নির্দেশ করার ক্ষেত্রে সাধু ও চলিত ভাষায় পার্থক্য লক্ষ করা যায়। নামপদের 'দুই' সংখ্যাবাচকতা বোঝানোর ক্ষেত্রে সাধু ভাষায় 'দ্বয়' দুইটি ব্যবহার করা হয়, আর চলিত ভাষায় ব্যবহার করা হয় 'দুটি', 'দুটো' অথবা 'জোড়া'। যেমন

সাধু	চলিত
ভাতৃদ্বয়	ভাইদুটো, দুটোভাই, দু'ভাই
পাখী দুইটি	পাখি দুটো
শাড়ি দুইটি	একজোড়া শাড়ি
হস্তিদ্বয়	একজোড়া হাতি

চলিত বাংলায় কারকের ক্ষেত্রে বিভক্তির প্রয়োগ সাধু বাংলার মত কখনো কখনো অনিবার্য হয়ে ওঠে না। যেমন–

কর্ম ঃ ছেলে ডেকে রাত দুপুরে লোক জাগাচ্ছো কেন?

করণ ঃ তারা জোর ফুটবল খেলেছে।

অপাদান ঃ ছাদ-চোয়ানো জলে ঘর ভেসে গেল।

অধিকরণ ঃ পাড়া-বেড়ানি মেয়ে। গাছ পাকা আম।

গ. শব্দ গঠনগত পার্থক্য

যদিও চলিত বাংলায় সমাসবদ্ধ শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা খুব কম। কিন্তু চলিত বাংলায় সমাসের ব্যবহার অত্যন্ত সহজ। পাশাপাশি দুটো শব্দের উচ্চারণে ফাঁক না থাকলেই তা সমাসবদ্ধ ধরা হয়। যেমন–

চোর ডাকাত ধরলে **মাবাপের** নাম ভুলিয়ে ছাড়বে। (দ্বন্দ্ব সমাস)

এমন মনভোলা যে **গাছপাকা** আমগুলো ফেলে এলে। (তৎপুরুষ)

ঘ. পদবিন্যাসগত পার্থক্য

সাধু বাংলায় সর্বক্ষণই পদবিন্যাসে একটি নির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করা হয়। সেখানে বাক্যের প্রাথমিক গঠন হল 'কর্তা+কর্ম+ক্রিয়া' অর্থাৎ প্রথমে উদ্দেশ্য পরে বিধেয়। আর উদ্দেশ্যের মূল অংশ হচ্ছে কর্তা তা বসে কর্মের আগে। বাক্যের বিধেয় থাকে শেষে। আর বিধেয়ের মূল অংশ ক্রিয়াপদ তা বসে সব সময় বাক্যের শেষে– সমস্ত কারকের পর। যেমন– মুনমুন সব সময় মায়ের কথা শোনে। কিন্তু চলিত বাংলায় সব সময় এক্রম রক্ষিত হয় না, প্রায়ই পরিবর্তিত হয়। যেমন–

কিছু খাইনি তো সাত দিন।

ওকে দেখবার পরই ভুল ভাঙলো আমার।

'রামানন্দ পেলেন গুরুর পদ।'

দুটি অনুসর্গ সম্পর্কে সতর্কতা

'টি' এবং 'গুলি' এ দুটি অনুসর্গ (নির্দেশক) সাধু বাংলার– তা চলিত বাংলায় ব্যবহৃত হয় না। চলিত বাংলায় 'লোকটি' নয় লোকটা, 'মেয়েটি' নয় 'মেয়েটা'। একইভাবে চলিত বাংলায় 'গাছগুলি' নয় 'গাছগুলো', মাছগুলি', নয়, 'মাছগুলো' ইত্যাদি।

বিভিন্ন কালের ক্রিয়ারূপে সাধু ও চলিত ভাষায় কি পরিবর্তন ঘটে তা নিচে দেখানো হল।

১. ঘটমান বর্তমান

সাধু	**চলিত**	
হাসিতেছি করিতেছি	হাসছি করছি	উত্তম পুরুষ
হাসিতেছ করিতেছ	হাসছো করছো	মধ্যম পুরুষ
হাসিতেছিস করিতেছিস	হাসছিস করছিস	মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছার্থক)
করিতেছেন হাসিতেছেন	করছেন হাসছেন	তৃতীয় পুরুষ(সম্মানার্থক)
হাসিতেছে করিতেছে	হাসছে করছে	তৃতীয় পুরুষ (সাধারণ)
২. পুরাঘটিত বর্তমান		
সাধু	**চলিত**	
হাসিয়াছি করিয়াছি	হেসেছি করেছি	উত্তম পুরুষ
হাসিয়াছিস করিয়াছিস	হেসেছিস করেছিস	মধ্যম পুরুষ
হাসিয়াছিস করিয়াছিস	হেসেছিস করেছিস	মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছার্থক)
হাসিয়াছেন করিয়াছেন	হেসেছেন করেছেন	তৃতীয় পুরুষ (সম্মানার্থক)
হাসিয়াছে করিয়াছে	হেসেছে করেছে	তৃতীয় পুরুষ (সাধারণ)
৩. সাধারণ		
সাধু	**চলিত**	
হাসিলাম করিলাম	হাসলাম হাসলুম করলুম	উত্তম পুরুষ
হাসিলে করিলে	হাসলে করলে	মধ্যম পুরুষ
হাসিনি করিলি	হাসলি করলি	মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছার্থক)
হাসিল করিল	হাসলো করলো করলে	তৃতীয় পুরুষ (সাধারণ)
৪. ঘটমান অতীত		

সাধু	চলিত	
হাসিতেছিলাম করিতেছিলাম	হাসছিলাম করছিলাম	উত্তম পুরুষ
হাসিতেছিলে করিতেছিলে	হাসছিলে করছিলে	মধ্যম পুরুষ
হাসিতেছিলি করিতেছিলি	হাসছিলি করছিলি	মধ্যমপুরুষ (তুচ্ছার্থক)
হাসিতেছিলেন করিতেছিলেন	হাসছিলেন করছিলেন	তৃতীয় পুরুষ (সম্মানার্থক)
হাসিতেছিল করিতেছিল	হাসছিল করছিল	তৃতীয় পুরুষ (সাধারণ)
৫. সম্পন্ন অতীত		
সাধু	**চলিত**	
হাসিয়াছিলাম করিয়াছিলাম	হেসেছিলাম করেছিলাম	উত্তম পুরুষ
হাসিয়াছিলে করিয়াছিলে	হেসেছিলে করেছিলে	মধ্যম পুরুষ
হাসিয়াছিলি করিয়াছিলি	হেসেছিলি করেছিলি	মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছার্থক)
হাসিয়াছিলেন করিয়াছিলেন	হেসেছিলেন করেছিলেন	তৃতীয় পুরুষ (সম্মানার্থক)
হাসিয়াছিল করিয়াছিল	হেসেছিল করেছিল	তৃতীয় পুরুষ (তুচ্ছার্থক)
৬. সাধারণ ভবিষ্যত		
সাধু	**চলিত**	
হাসিব করিব	হাসবো করবো	উত্তম পুরুষ
হাসিবে করিবে	হাসবে করবে	মধ্যম
হাসিবি করিবি	হাসবি করবি	মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছার্থক)
হাসিবেন করিবেন	হাসবেন করবেন	তৃতীয় পুরুষ (সম্মানার্থক)
হাসিবে করিবে	হাসবে করবে	তৃতীয় পুরুষ (তুচ্ছার্থক)

সাধু ভাষারীতির নমুনা

অনিরুদ্ধ এবং হিরু পাল– এই দুইজনেই গ্রামখানার সমস্ত শৃঙ্খলা ভাঙিয়া দিল। ওই সঙ্গে গিরীশ ছুতার, তারা নাপিত ও আছে। দেবু আশ্চর্য হইয়া ভাবিতেছিল– অনিরুদ্ধ ঐ দম্ভভরে সামাজিক নিয়ম উপেক্ষা করিয়া চন্ডীমন্ডপ হইতে ভোগ উঠাইয়া লইয়া গেল, অথচ সমাজের কেউ তাহাকে প্রতিরোধ করিতে পারিল না, ইহার কি কোন প্রতিকার নাই? এ কয়েকদিন সে নিজেই লোকের দুয়ারে দুয়ারে ফিরিয়াছে, গ্রামের লোক তাহাকে ভালবাসে, অনেকে শ্রদ্ধা করে; কিন্তু

এক্ষেত্রে সকলেই বলিয়াছে এক কথা– এর আর করবে কি দেবু? উপায় কি বল? যদি থাকে তাহলে তুমি কর। তবে বুঝেচ কি না– উ হবে না! কি সমাজ ক'রছ? সমাজ কই?

–গণদেবতা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অপু খাইতে খাইতে অবাক হইয়া সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিল। দিদি পুঁতির মালা চুরি করিয়া আনিয়াছিল কিনা তাহা সে জানে না– পুঁতির মালাটা সে ইহার আগে কোনও দিন দেখে নাই– কিন্তু আমের গুঁটি যে চুরির জিনিস নয় তাহা সে নিজে জানে। কাল বৈকালে দিদি, তাহাকে সঙ্গে করিয়া টুনুদের বাগানে আম কুড়াইতে গিয়াছিল এবং সোনামুখির তলায় আম ক'টা পড়িয়াছিল, দিদি কুড়াইয়া লইল, সে জানে কাল হইতে দিদি অনেকবার বলিয়াছে– ও অপু, এবার সেই আমের গুঁটিগুলো জারাবো, কেমন তো? কিন্তু মা অসুবিধাজনকভাবে বাড়ি উপস্থিত থাকার দরুণ উক্ত প্রস্তাব আর কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। দিদির অত্যন্ত আশার জিনিস আমগুলো এভাবে লইয়া গেল, তাহার উপর দিদির এরূপভাবে মারও খাইল। দিদির চুল ছিড়িয়া দেওয়ায় মায়ের উপর তাহার অত্যন্ত রাগ হইল।

–পথের পাঁচালী : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

চলিত ভাষারীতির নমুনা

কোণের ঘরটি আমার জন্য আলাদা করা আছে। ছোটো ঘর জানালার বাইরে মা-র বাগানের শিউলি আর স্থলপদ্ম, ভাঙা পাঁচিলের ফাঁকে পুকুরটা চোখে পড়ে। বাড়িতে যত ভিড়ই হোক ও ঘরের অংশ তিনি কাউকেই দেন না, কেউ আশাও করে না তা। কেননা– দু-পক্ষই মেনে নিয়েছে কথাটা আীয়দের সঙ্গে আমার যোগাযোগ নামমাত্র, যাকে বলে ফর্ম্যাল। তারা যখন তাস খেলেন, বা 'দেশের অবস্থা' বিষয়ে আলোচনা করেন, বা বেঁধে রসনার কালীমন্দিরে যান, তখন আমি যে সে সব ব্যাপারে যোগ দেবে তা সম্ভাবনার বাইরে ব'লেই ধ'রে নেয়া হয়।

– নীলাঞ্জনের খাতা : বুদ্ধদেব বসু

সমুদ্র মেখলা স্রোতস্বিনীর ধারাারর্শী নীল বনাচ্ছন্ন এক ভূমি। কবে সেই সৃষ্টির আদিতে যখন তৃতীয় হিমবাহর যুগ অতীত হয়ে পৃথিবীর বুকে নেমেছে সোনালী বসন্ত। কিন্তু তখনও জন্মলগ্নের আলোড়ন হিমালয়ের পূর্ব-দক্ষিণ সীমানায়, সেই জন্মলগ্নের বেদনা-আনন্দের মধ্য দিয়ে নীল জলধির বুক চিরে দেবী ভেনাসের মত জেগে উঠেছিল এই ভূখণ্ড। পাষাণ পর্বতের অন্তঃস্থল থেকে যে পয়োধর সদৃশ ধারা কিশোরীর চঞ্চলতার নৃত্যছন্দে স্বচ্ছ শরীরে ঘর ছেড়েছিল সেই ক্ষীণাঙ্গী ধারাই পূর্ণযৌবনা হয়ে জন্ম দিল এক সুবর্ণ পলিখণ্ড সমতট।

–বং থেকে বাংলা : রিজিয়া রহমান

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন

১। সাধু ও চলিত ভাষার প্রধান পার্থক্য নির্ভরশীল

ক) লিখিত ও মৌখিক রীতির ওপর ☐ খ) সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ওপর ☐

গ) তৎসম ও তদ্ভব শব্দের ওপর ☐ ঘ) অর্ধতৎসম ও দেশী শব্দের ওপর ☐

২। সাধু ভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়া রূপ ব্যবহৃত হয়

ক) পূর্ণ ও দীর্ঘ রূপ ☐ খ) অপূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত রূপ ☐

গ) পূর্ণ ও দীর্ঘ উভয় রূপ ☐ ঘ) কোনটিই নয় ☐

৩। চলিত ভাষার প্রমিত রূপ গড়ে উঠেছে কোন অঞ্চলের ভাষাকে কেন্দ্র করে?

ক) কলিকাতা ☐ খ) ঢাকা ☐

গ) পূর্ববাংলা ☐ ঘ) নদীয়া শান্তিপুর ☐

৪। চলিত ভাষার ভিত্তি হচ্ছে

ক) আঞ্চলিক উচ্চারণ ☐ খ) গ্রাম্য উচ্চারণ ☐

গ) শাহরিক উচ্চারণ ☐ ঘ) মৌখিক উচ্চারণ ☐

৫। 'টি এর গুলি' এ অনুসর্গ দুটি ব্যবহৃত হয়-

ক) সাধু বাংলায় ☐ খ) চলিত বাংলায় ☐

গ) আঞ্চলিক বাংলায় ☐ ঘ) অপ্রচলিত বাংলায় ☐

৬। নিচের অনুচ্ছেদগুলো চলিত বাংলায় রূপান্তর করুন :

ক) সমস্ত মজলিশটা স্তব্ধ হইয়া গেল। ছ্যাঁচড়ার দলের ছোকরা কয়টি বিড়ি টানিতে টানিতে মৃদুস্বরে রসিকতা করিতেছিল– তাহারা পর্যন্ত সবিস্ময়ে দেবু ঘোষের মুখের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। অনুত্তেজিত শান্ত স্বরে উচ্চারিত কথা কয়টি শুনিয়া সকলেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল– এবং কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখে আশ্চর্য সে এক মিষ্ট হাসি ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া তাহাদের বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না।

খ) যাহাকে বলে খাঁটি চাষী, সেই খাঁটি চাষীর ঘরের ছেলে সে। বাপ তাহার নিজের হাতে লাঙল ধরিয়া চাষ করিত। কাঁধে করিয়া বাঁক বহিত। সারের ঝুড়ি মাথায় তুলিয়া গাড়ি বোঝাই করিত, ধানের বোঝা মাঠ হইতে মাথায় বহিয়া ঘরে আনিত; গরুর সেবা করিত। দেবুও ছেলেবেলায় ভাগের রাখালের পালে গরু দিয়া আসিয়াছে, গরুর সেও সে সময় নিয়মিত করিত, চাষের সময় বাপের জন্য জল খাবার মাঠে লইয়া যাইত।

গ) বাংলাদেশে ভাষা বিবর্তনের প্রধান কারণ কিন্তু ইউরোপীয় চিন্তা ও ভাবের সংঘাত। সুতরাং যেই এই ধাক্কা লাগিল তখনই বাংলা ভাষার পরিবর্তন হইতে আরম্ভ করিল, উহার অতিরিক্ত বাঙালীর মধ্যে ভাষাগত একটা দ্বিত্বও দেখা দিল, অর্থাৎ শিক্ষিত বাঙালী বাংলা ও ইংরেজী দুই ভাষাই, ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। ইহার ফলে যে দ্বন্দ্ব ও সমস্যার সৃষ্টি হইল তাহা আজও চলিয়াছে।

ঘ) ললিতা ধীরে ধীরে ক্যাবিনের দরজা খুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, রাত্র শেষের শিশিরার্দ্র অন্ধকার তখনও নদীর উপরকার মুক্ত আকাশ এবং তীরের বনশ্রেণীকে জড়াইয়া রহিয়াছে– এইমাত্র একটি শীতল বাতাস উঠিয়া নদীর জলে কলধ্বনি জাগাইয়া তুলিয়াছে এবং নিচের তলায় এঞ্জিনের খালাসিরা কাজ আরম্ভ করিবে এমনতর চাঞ্চল্যের আভাস পাওয়া যাইতেছে।

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। খ ২। ক ৩। ঘ ৪। ক ৫। ক

ধ্বনি পরিবর্তনের রীতি নিয়ম ও পরিচয়

ইউনিট ৩

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- শব্দের ধ্বনি পরিবর্তনের রীতি নিয়ম সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- ধ্বনি পরিবর্তন সূত্রের সংজ্ঞা ও উদাহরণ দিতে পারবেন।
- বাংলা ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তনের পরিচয় জানবেন।

পাঠটি বারবার পড়ুন। তাহলে আপনি ধ্বনি পরিবর্তনের বিষয় সম্পর্কে সহজে লিখতে পারবেন।

প্রস্তাবনা

মানুষ যখন কথা বলে তখন আসলে সে অনেকগুলো ধ্বনি উচ্চারণ করে। অর্থবোধক ধ্বনি সমষ্টি হল ভাষা। মানুষ অর্থবোধক ধ্বনিই উচ্চারণ করে অর্থাৎ মানুষ ভাষা সৃষ্টি করে। ধ্বনিগুলো পাশাপাশি অবস্থান করে। কথা বলার সময় দেখা যায় একটি ধ্বনি আরেকটি ধ্বনি দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। কিংবা দুই ধ্বনির মাঝামাঝি আরেকটি নতুন ধ্বনি এসে যাচ্ছে। উচ্চারণের টানটুনে এবং জিহ্বার গতিশীলতায় উচ্চারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। মানুষ চায় সহজে উচ্চারণ করতে। একটা পরিবেশে থাকতে থাকতে মানুষ যেভাবে উচ্চারণ করতে শেখে তা-ই তার উচ্চারণ ভঙ্গি তৈরি করে। এভাবে শিষ্ট ভাষার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষার বিরোধও বাধে। সে যাই হোক, ভাষা সব সময় পরিবর্তনশীল। ধ্বনি পরিবর্তনও ভাষার একটি স্বাভাবিক নিয়ম। বাংলা একটি জীবন্ত ভাষা। এই ভাষাও ধ্বনি পরিবর্তনের অধীন। এই ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের বৈচিত্র্য নিম্নরূপ ঃ

১) স্বরাগম

শব্দের প্রথম বর্ণ সংযুক্ত হলে সহজভাবে উচ্চারণের জন্য ঐ বর্ণের আগে আ বা ই স্বর যোগ করাকে বলা হয় স্বরাগম।

যেমন-

আরর্ধা [আ+রর্ধা]

ইস্টিশন [ই+স্টেশন], ইস্কুল [ই+স্কুল]

২) স্বরসংগতি

শব্দের ভিতরে যে স্বরধ্বনিগুলো রয়েছে সেগুলো যখন উচ্চারণের সময় একরূপ ধারণ করে কিংবা সংগতি পেতে চায় তখন তাকে স্বরসংগতি বলে।

যেমন-

দেশি > দিশি, বিলাতি > বিলিতি

মিলামিশা > মেলামেশা, হিসাব> হিসেব

সুবিধা > সুবিধে, ইচ্ছা> ইচ্ছে
চিরনি> চিরুনি, ধূলা > ধুলো, পূজা > পুজো
তখনি > তখুনি, এখনি > এখুনি ইত্যাদি।

৩) স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ

উচ্চারণকে সহজ করার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণকে ভেঙে অ, ই, এ, ও, উ ইত্যাদি স্বরধ্বনি যোগ করাকে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বলে।

যেমন,
স্বরধ্বনি যোগে → যত্ন > যতন [য+ত্+ন> য+ত্+অ+ন]
এইভাবে রত্ন > রতন, বর্ষ> বরষ, ।রর্শ > পরশ, জন্ম > জনম, কর্ম> করম, স্বপ্ন > স্বপন
ই-স্বরধ্বনি যোগে → প্রীতি > পীরিতি [(প্র+ঈ+ত+ই) > (প+ঈ+র+ই+ত+ই)]
এইভাবে শ্রী> ছিরি, ফ্লিম> ফিলিম
এ স্বরধ্বনি যোগে → গ্রাম > গেরাম [(গ্র+আ+ম) > (গ+এ+রা+আ+ম)]
এইভাবে ট্রাম > টেরাম
প্রেক > পেরেক
গ্লাস > গেলাস
শ্রাদ্ধ > ছেরাদ্দ
ও-স্বরধ্বনি যোগে → শ্লোক > শোলোক [(শ্+ল্+ও+ক) > (শ্+ও+ল+ও+ক)]
এইভাবে মুর্গ্ > মোরগ
উ-স্বরধ্বনি যোগে → ভ্রূ > ভুরু [(ভ্+র্+ঊ) > (ভ্+উ+র+উ)]
এইভাবে পুত্র > পুত্তুর, মুক্তা > মুকুতা, শুক্র> শুক্কুর (বার), পদ্মিনী > পদুমিনী, সূর্য > সুরুজ।

৪) বর্ণ বিপর্যয়

উচ্চারণের সময় শব্দের মধ্যবর্তী ধ্বনির স্থান পরিবর্তন ঘটলে বর্ণ বিপর্যয় বলা হয়।

যেমন- রিক্শা > রিশ্কা, বাক্স > বাস্ক, পিশাচ > পিচাশ ইত্যাদি।

৫) স্বরলোপ

উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত স্বরধ্বনির লোপকে স্বরলোপ বলা হয়।

যেমন- উধার > ধার (উ স্বরধ্বনির লোপ)
বড় দাদা > বড়্দা (ড় এর সঙ্গে যুক্ত অ স্বরধ্বনির লোপ)

৬) অন্তর্হতি

শব্দের মধ্যস্থ কোন স্বরহীন বা স্বরযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ ঘটলে তাকে অন্তর্হতি বলা হয়।

যেমন-
পূর্ব > পুব (র্ এর বিলোপ)
ফাল্গুন > ফাগুন (ল্ এর বিলোপ)

ফলাহার > ফলার (হা-এর বিলোপ)

৭) বর্ণচ্যুতি

উচ্চারণের সময় দুটি একজাতীয় বর্ণের একটির লোপ হলে তাকে বর্ণচ্যুতি বলা হয়।

যেমন-

ছোট দাদা > ছোট্‌দা

বউ দিদি > বউদি

মেজ দিদি > মেজদি

ঠাকুর দাদা > ঠাকুর দা

৮) সমীভবন বা সমীকরণ

শব্দের মধ্যে অবস্থিত দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ যখন উচ্চারণের সময় একই রূপ ধারণ করে তখন তাকে বলা হয় সমীভবন বা সমীকরণ।

যেমন-

পদ্ম > পদ্দ, কাঁদ্‌না > কান্না, রাঁধ না > রান্না।

৯) সমীকরণ

একই স্বরের পুনরাবৃত্তি না করে আ-স্বর যোগে উচ্চারণ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার যে নিয়ম তাকে বলা হয় অসমীকরণ।

যেমন-

গপ গপ > গপাগপ, টপ টপ > টপাটপ, দম দম > দমাদম।

১০) সম্প্রকর্ষ

কথ্য ভাষায় দ্রুত উচ্চারণের কারণে শব্দের মধ্যে অবস্থিত কোন বর্ণের স্বরলোপকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ।

যেমন-

জানালা > জান্‌লা, দরজা > দর্‌জা, বসতি > বস্‌তি

১১) বর্ণদ্বিত্ব

জোর দেওয়ার জন্য শব্দের মধ্যে অবস্থিত কোন বর্ণের দুবার উচ্চারণকে বর্ণদ্বিত্ব বলা হয়।

যেমন-

ছোট > ছোট্ট, বড় > বড্ড, সকাল > সক্কাল, পাকা > পাক্কা।

১২) বর্ণ বিকৃতি

শব্দস্থিত কোন ব্যঞ্জন বর্ণ নতুন রূপ ধারণ করলে তাকে বলা হয় বর্ণবিকৃতি।

যেমন-

ধাইমা > দাইমা, ধোবা > ধোপা

১৩) বিষমীভবন

শব্দের মধ্যে দুটি এক জাতীয় বর্ণের একটির পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলা হয় বিষমীভবন।

যেমন- শরীর> শরীল

১৪) অপিনিহিতি

শব্দের ভিতরে 'ই' বা 'উ' থাকলে সেই 'ই' বা 'উ' কে আগে উচ্চারণ করাকে অপিনিহিতি বলা হয়।

যেমন, বসিয়া>বইস্যা

আঞ্চলিক ভাষায় অপিনিহিতির প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে।

কাল> কাইল্যা	আজি>আইজ
রাখিয়া > রাইখ্যা	রাতি > রাইত
হাসিয়া > হাইস্যা	জাতি > জাইত
ধরিয়া > ধইর‍্যা	জেলে > জাইল্যা
করিয়া > কইর‍্যা	সাধু > সাউধ
	মেয়ে > মাইয়া

১৫) অভিশ্রুতি

অপিনিহিতির 'ই' 'উ' ইত্যাদি ধ্বনির পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে প্রভাবিত করে নতুন রূপ ধারণ করাকে অভিশ্রুতি বলে।

যেমন-

করিয়া > কইরা > করে

হাসিয়া > হাইস্যা > হেসে

ধরিয়া > ধইর‍্যা > ধরে

আজি > আইজ > আজ

কালি > কাইল > কাল

রাতি > রাইত > রাত

বাংলা চলিত রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অভিশ্রুতি। মান কথ্য ভাষায় অভিশ্রুতিজাত শব্দ ব্যবহৃত হয়।

১৬ 'য়' শ্রুতি ও 'ব' শ্রুতি

শব্দের ভিতরের পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি মিলে যদি যৌগিক স্বর না হয়, তাহলে ঐ দুই স্বরের মধ্যে অন্ত:স্থ 'য়' বা অন্ত :স্থ 'ব' আগম ঘটে। **এই অন্ত:স্থ 'য়'-শ্রুতি, আর অন্ত:স্থ'ব' হল ব-শ্রুতি।**

যেমন

'য়' শ্রুতি

মা+আমার>মায় আমার [আ+য়+আ]

ব-শ্রুতি

খা+আ>খাওয়া [আ+ও+আ]

যা+আ>যাওয়া [আ+ও+আ]

১৭) র-কার লোপ

কথ্য বাংলায় সাধারণত ‘র’ এর লোপ হয়ে পরবর্তী বর্ণের দ্বিত্ব হয়।

যেমন

কর্ম>কম্ম

শিরনি> শিন্নি

তর্ক > তক্ক

১৮) হ-কার লোপ

কথ্য বাংলায় ‘হ’ এরও লোপ হয়।

যেমন-

কহে>কয় চাহ > চাও

দধি > দই আলাহিদা > আলাদা

ফলাহার > ফলার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

এখানে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। পাঠটি ভালো করে পড়ে আপনি প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজে লিখুন।

১. ভাষায় ধ্বনি-পরিবর্তন কেন হয়?

২. স্বরভক্তি কাকে বলে? পাঁচটি উদাহরণ দিন।

৩. স্বরাগম ও সমীভবন কাকে বলে? তিনটি করে উদাহরণ দিন।

৪. উদাহরণসহ সংজ্ঞা লিখুন
স্বরসংগতি, বর্ণচ্যুতি, অসমীকরণ, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি।

৫. অপিনিহিতি থেকে অভিশ্রুতি হওয়ার সাতটি দৃষ্টান্ত দিন।

৬. নিম্ন বর্ণিত ধ্বনি পরিবর্তনগুলোর নাম লিখুন ঃ

ক. গাহে > গায়

খ. শরীল > শরীল

গ. বড় > বড্ড

ঘ. বসতি > বস্‌তি

ঙ. ফাল্গুন > ফাগুন

চ. দে+আ > দেওয়া

ছ. ধর্ম > ধম্ম

ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান

ইউনিট ৪

ভূমিকা

ভাষার সবচেয়ে বড় সম্পদ তার শব্দরাজি; পৃথিবীর সব উন্নত ভাষারই রয়েছে বিপুল শব্দসম্ভার। বাংলা ভাষাও শব্দ সম্পদে বেশী ধনী। কিন্তু ঐ বিপুল শব্দরাজি একদিনে ভাষায় ঠাঁই পায়নি– দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়েছে এত সব শব্দ বাংলা ভাষায় জমে উঠতে। বাংলা ভাষায় ঐ সব শব্দের সমাবেশ ঘটেছে বিভিন্ন উৎস থেকে। শব্দগুলোর উৎস অনুসারে অর্থাৎ শব্দটি ঠিক কোথা থেকে এসেছে সে অনুসারে বাংলা শব্দসম্ভারকে ভাগ করা হয় পাঁচ ভাগে। আপনারা এতোক্ষণে মনে করতে পারছেন ঐ পাঁচ ভাগের নাম? কি মনে পড়েছে? তৎসম শব্দ, অর্ধতৎসম শব্দ, তদ্ভব শব্দ, দেশী শব্দ, বিদেশী শব্দ– এই পাঁচ ভাগের কথা? মনে পড়েছে নিশ্চয়ই। এই যে পাঁচ রকম শব্দ, এর মধ্যে যেগুলো তৎসম শব্দ সেগুলো বাংলায় এসেছে সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকে – অর্থাৎ আসতে আসতে শব্দের আগের চেহারায় কোন বদল ঘটেনি। চেহারা বদলে যায়নি বলেই ঐ ধরনের শব্দের নাম তৎসম অর্থাৎ তার সমান। কার সমান? ঐ যে বললাম, সংস্কৃত শব্দ, তার সমান বা তার মত– সংস্কৃত ভাষার আর বাংলা ভাষার যাদের চেহারা একেবারে হুবহু মিলে যায়। তৎসম শব্দগুলোর বানানের ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম বাংলাতে রয়েছে, যাদের একটির নাম ণ-ত্ব বিধান, অন্যটি ষ-ত্ব বিধান।

মনে রাখবেন

ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান কেবল তৎসম শব্দের বেলাতেই কার্যকরী– অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশী বা বিদেশী শব্দের বেলাতে নয়।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

- বাংলায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দে ণ-এর যথাযথ ব্যবহার করতে পারবেন।
- বাংলায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দে ষ-এর যথাযথ ব্যবহার করতে পারবেন।
- তৎসম শব্দের বানানে ণ ও ষ এর কারণে ঘটিত বানান ভুল এড়াতে পারবেন।
- বাংলা বানানের ক্ষেত্রে ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

পাঠ ১ ঃ ণ-ত্ব বিধান

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাংলা বানানোর ক্ষেত্রে ণ-ত্ব বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন।
- কতিপয় শব্দে ণ-ত্ব বিধানের ব্যতিক্রম নির্দেশ করতে পারবেন।
- স্বভাবতই ণ-হয় এমন কিছু শব্দের তালিকা তৈরি করতে পারবেন।

আগেই বলেছি, আপনাদেরও নিশ্চয়ই মনে আছে, যে খাঁটি বাংলা শব্দের (দেশী শব্দের) বানানের বেলাতে মূর্ধন্য ব্যবহারের রীতি নেই। তাই যদি এমন হত যে বাংলাতে কেবল দেশী শব্দই আছে, কোন তৎসম শব্দ নেই, তাহলে বানানের ক্ষেত্রে মূর্ধন্য ণ আর দন্ত্য ন এর ব্যবহার নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামালেও চলতো। কিন্তু আমরা এ পাঠের ভূমিকাতে যে শব্দ সম্ভারের কথা বলেছি সেখানে চোখ মেলালেই দেখতে পাব বাংলা ভাষা আমরা যে সকল শব্দ ব্যবহার করছি তার মধ্যে রয়েছে অগণিত তৎসম শব্দ– যেগুলো সংস্কৃত শব্দ হতে অবিকৃতভাবে এসে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। আর ঐ সকল তৎসম শব্দে যদি ণ-ত্ব বিধান মানা হয়ে থাকে তবে বাংলাতেও অবশ্যই মানতে হবে। ফলে বাংলা বানানের শুদ্ধতার জন্যে ণ-ত্ব বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া, ণ-ত্ব বিধানের সঠিক ব্যবহার না করলে শব্দের বানানরূপ বদলে গিয়ে অর্থ বিভ্রাট তৈরি হতে পারে। এ কারণেও ণ-ত্ব বিধান আয়ত্ত করা জরুরি। ণ-ত্ব বিধানগুলো জানার আগে, আসুন, আমরা প্রথমেই জেনে নিই ণ-ত্ব বিধান কাকে বলে

সংস্কৃত ভাষায় দন্ত্য-ন এর মূর্ধন্য-ণ-তে পরিবর্তনের নিয়মকে ণ-ত্ব বিধান বলে।

১. 'ট' বর্গীয় বর্ণের (ট, ঠ, ড, ঢ, ণ) সঙ্গে কেবল 'ণ' যুক্ত হয়। যেমন কণ্টক, ঘণ্টা, কণ্ঠ, লুণ্ঠন, অবগুণ্ঠন, খণ্ড, ভাণ্ড, কাণ্ড ইত্যাদি।

মনে রাখবেন ঃ

'ত' বর্গীয় বর্ণের (ত, থ, দ, ধ, ন) আগে কখনো 'ণ' যুক্ত হয় না, কেবল 'ন' হয়। যেমন - অন্ত, প্রান্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন, বন্ধন ইত্যাদি।

২. "ঋ' 'র' 'ষ'-এর পরে 'ণ' বসে।
যেমন ঋণ, তৃণ, ঘৃণা, বর্ণ, বিকীর্ণ, ভীষণ, বিষাণ, লক্ষণ ইত্যাদি।

৩. 'ঋ', 'র', 'ষ'এর পরে স্বরবর্ণ, ক-বর্গীয় বর্ণ, প-বর্গীয় বর্ণ, 'ষ' অন্তস্থ'ব', 'হ' অথবা অনুস্বার থাকলে 'ণ' হয়।
যেমন চরণ, হরিণ, রেণু, কৃপণ, অর্পণ, নির্বাণ, লক্ষ্মণ, প্রয়াণ, ম্রিয়মাণ, প্রমাণ, গ্রহণ ইত্যাদি।

মনে রাখবেন

'ঋ', 'র', 'ষ' এবং 'দন্ত্য ন' এর মাঝে অন্য কোন বর্গের বর্ণ থাকলে 'ন' 'ণ' পরিণত হয় না। যেমন– রচনা, অর্চনা, দর্শন, নর্তন, প্রার্থনা ইত্যাদি।

৪. সমাসবদ্ধ শব্দে পূর্বপদে 'ঋ' 'র' 'ষ' যদি থাকে তবে পরপদের 'ন' 'ণ'-তে রূপান্তরিত হয় না।
যেমন– সর্বনাম, বরানুগমন, ত্রিনয়ন, দুর্নাম, দুর্নিবার, দুর্নীতি ইত্যাদি।

মনে রাখবেন

সমাস সত্ত্বেও কতকগুলো শব্দে 'ন'-এর জায়গায় 'ণ' হয়।

যেমন– অগ্রহায়ণ(অগ্র+হায়ন), উত্তরায়ণ(উত্তর+অয়ন), রামায়ণ (রাম+অয়ন), অপরাহ্ণ (অপর+অহ্ন), শর্পণ যা (শর্প+ নখ+আ), পূর্বাহ্ণ (পূর্ব+অহ্ন) ইত্যাদি।

৫. প্র, পরা, পরি, নির প্রভৃতি উপসর্গের পর কোন কোন ক্ষেত্রে 'ণ' হয়।

যেমন– প্রণাম, প্রণয়, প্রণয়ন, প্রণিপাত (প্র++নিপাত), প্রণীত, প্রবাহিনী, পরিণয়, পরিণত, পরিবহণ, নির্ণয়, নির্ণীত, ইত্যাদি।

মনে রাখবেন

ওপরের নিয়মটি মেনে চলার কথা থাকলেও পরিনির্বাণ, নির্নিমেষ, প্রনষ্ট হয়; কোন ভাবেই পরিনির্বাণ, নির্ণিমেষ, বা প্রণষ্ট হয় না। ফলে আমরা এই শব্দগুলোর বানানকে নিয়মের ব্যতিক্রম হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি।

৬. কতকগুলো তৎসম শব্দে স্বভাবতই 'ণ' হয়। আপনাদের সুবিধার জন্য শব্দগুলোর একটি তালিকা ছড়ার আকারে তুলে দেওয়া হল। ছড়া কেটে কেটে শব্দগুলোর বানান মুখস্ত করে রাখলে আর ভুল হবে না। তাহলে ছড়াটি শিখে ফেলুন কিন্তু ছড়াটির অর্থ খুঁজতে যাবেন না।

বাণিজ্য ভণিতা ভাণ লাবণ্য শোণিত,
আপণ কঙ্কণ কোণ গণনা গণিত
চাণক্য নিক্কণ তূণ কফোণি নিপুণ
লবণ বণিক স্থাণূ গুণী গুণ তূণ।
বীণা কণা মণি পাণি বাণ পণ্য পণ
মাণিক্য নৈপুণ্য গণ্য ফণী পুণ্য গণ॥

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. নিচের প্রতিটি শব্দের শুদ্ধ বানান পাশের খালি জায়গায় লিখুন।

ভীষণ ....., লক্ষণ ....., প্রমাণ .....,
গ্রহণ ....., হরিণ ....., দুর্ণাম .....,
দুণীতি ....., সর্বণাম ....., পরিণয় .....,
নির্ণয় ....., ক্রন্দণ ....., নিক্কন .....,
প্রার্থনা .....,, লাবন্য ....., দর্শণ .....,
পূর্বাহ্ন ....., অপরাহ্ন ....., মধ্যাহ্ন .....।

২. ণ-ত্ব বিধানের নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে এমন তিনটি শব্দ নিচের খালি জায়গায় লিখুন ঃ

....., ..., ..., ..., ...,

৩. স্বভাবতই 'ণ' হয় এমন দশটি শব্দের একটি তালিকা তৈরি করুন।

পাঠ ২ ঃ ষ-ত্ব বিধান

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাংলা বানানের ক্ষেত্রে ষ-ত্ব বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন।
- ষ-ত্ব বিধানের কতিপয় ব্যতিক্রম নির্দেশ করতে পারবেন।
- ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণকরণের নিয়ম লিখতে পারবেন।

ষ-ত্ব বিধানও, ণ-ত্ব বিধানের মত, খাঁটি বাংলা শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভারের একটি দেশী শব্দেও 'ষ'-এর ব্যবহার খুঁজে পাওয়া যাবে না। দেশী শব্দের মত তদ্ভব ও বিদেশী শব্দেও 'ষ' এর ব্যবহার নেই। সুতরাং, মনে রাখতে সুবিধা হবে বলে আবারও বলি, **ণ-ত্ব বিধানের মত ষ-ত্ব বিধানও কেবল তৎসম শব্দের বেলাতেই প্রযোজ্য।** লেখার মধ্যে বার বার 'ণ'- ও 'ষ' ভুল করলে যে-কেউই বলে ফেলতে পারে, লোকটির 'ণ-ত্ব ষ-ত্ব' জ্ঞান নেই। এমন লজ্জার কথা যাতে শুনতে না হয় সেজন্য, আসুন ষ-ত্ব বিধানটাও শিখে নিই। শুরুতেই শিখতে হবে ষ-ত্ব বিধানের সংজ্ঞা।

সে-সমস্ত নিয়ম অনুসারে দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ হয় তাকে ষ-ত্ব বিধান বলে।

তৎসম শব্দে ষ-ত্ব বিধান

১. 'ঋ'-কারের পর 'ষ' বসে। যেমন- ঋষি, বৃষ, কৃষক, তৃষা, কৃষি।

মনে রাখবেন

সংস্কৃত 'কৃশ্' ধাতু থেকে সৃষ্ট শব্দে ঋ-কার থাকার পরও 'ষ' না হয়ে 'শ' হয়। যেমন কৃশ, কৃশকায়, কৃশাঙ্গ, কৃশানু, কৃশোদর।
ষ-ত্ব বিধানে এটি একটি ব্যতিক্রম।

২. 'ট' বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে কেবল 'ষ' যুক্ত হয়।
   যেমন- দুষ্টু, কষ্ট, সৃষ্ট, নষ্ট, কাষ্ঠ, পৃষ্ঠ, কনিষ্ঠ, প্রতিষ্ঠা, কণ্ঠ, কণ্ঠা ইত্যাদি।
৩. 'অ' 'আ'-ভিন্ন স্বর ববং 'ক' 'র'-এর পর বিভক্তি বা প্রত্যয়ের 'স' থাকলে তা ষ-তে রূপান্তরিত হয়।
   যেমন- কল্যাণীয়েষু, প্রীতিভাজনেষু, আবিষ্কার, গোষ্পদ, জিগীষা (জয়ের ইচ্ছা) ইত্যাদি চিকীর্ষ(করবার ইচ্ছ)।
৪. ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত (অধি, অনু, অভি, নি, পরি, প্রতি, সু) উপসর্গের পর কতকগুলো ধাতুর 'স' রূপান্তরিত হয়ে 'ষ' হয়। যেমন–

'অধি' উপসর্গযোগে – অধিষ্ঠান (অধি+স্থান), অধিষ্ঠাতা, অধিষ্ঠিত।

'অনু' উপসর্গ যোগে– অনুষঙ্গ (অনু+সঙ্গ), অনুষ্ঠান, অনুষ্ঠাতা।

'অভি' উপসর্গ যোগে – অভিষেক (অভি+সেক) অভিষিক্ত।

'নি' অথবা 'নির' উপসর্গযোগে – নিষ্কণ্টক, নিষেধ, নিষ্পাপ, নিষ্ফল।

'পরি' উপসর্গ যোগে– পরিষ্কার (পরি+কার), পরিষ্কৃত।

'প্রতি' উপসর্গ যোগে – প্রতিষেধ (প্রতি+সেধ), প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠান।

'বি' উপসর্গ যোগে – বিষণ্ন (বি+সন্ন), বিষুব, বিষাদ।

'সু' উপসর্গ যোগে সুষুপ্ত (সু+সুপ্ত) সুষমা, সুষ্ঠু ইত্যাদি।

৫. দুটি পদ সমাসযুক্ত হয়ে একটি শব্দ হলে প্রথম পদের শেষে যদি 'ই', 'উ', 'ঋ' অথবা 'ও' থাকে, তবে পরবর্তী শব্দের আদি বা শুরুর 'স' 'ষ'-য়ে পরিবর্তিত হয়। যেমন– যুধিষ্ঠির (যুধিথস্থির), সুষমা (সু+সমা), গোষ্ঠ (গো+স্থ) ইত্যাদি।

৬. কতকগুলো তৎসম শব্দে স্বভাবতই 'ষ' হয়। আপনাদের মনে রাখার সুবিধার জন্য ছন্দে গেঁথে দেয়া হল ঃ

আষাঢ় ঈষৎ ঈষা উষর নিকষ
বিশেষণ ভাষা ঊষা বিশেষ ষোড়শ
বিষাণ ও শোণ বিষ পুষ্প দোষ রোষ
মহিষ মূষিক পূষা পুরুষ প্রদোষ।
প্রত্যুষ ভূষণ কোষ ভূষা শষ্প শেষ,
বাষ্প ষট্ ভাষ্য পোষ্য অভিলাষ মেষ॥

৭. ব্যতিক্রম

ক) আমরা ওপরের ৪ নম্বর বিধানে বলেছি ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতকগুলো ধাতুর 'স' রূপান্ত রিত হয়ে 'ষ' হয়। কিন্তু কিছু কিছু শব্দের 'স' রূপান্তরিত হয়ে 'ষ' হয়না।

যেমন– অনুসরণ, অনুসন্ধিৎসা, অভিসার, পরিসমাপ্তি, পরিসীমা, বিসর্গ, পরিস্থিতি, সুসংবাদ, সুসময়, সুারষ্ট, সুসম্পন্ন ইত্যাদি।

খ) ারৃহ্ বা ারন্দ্ ধাতুর 'স' কখনো 'ষ' হয় না।

যেমন– নিারৃহ, নিারন্দ।

গ)'সাৎ' প্রত্যয়ের 'স' কখনো 'ষ' হয় না।

যেমন– অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ।

ঘ) স্ফুট্ ও স্ফুর ধাতুর 'স' পরিবর্তিত হয় না।

যেমন– দন্তস্ফুট, পরিস্ফুট, বিস্ফোরণ ইত্যাদি।

লক্ষণীয়

ক. আরবি, ফারসি, ইংরেজি ইত্যাদি বিদেশী ভাষা থেকে আগত শব্দে 'ষ' হয় না। তাই বিদেশী শব্দের বানানের ব্যাপারে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। যেমন– জিজ্ঞেস, পোশাক, সবুজ ইত্যাদি শব্দে যেন ভুলবশত 'ষ' ব্যবহার করবেন না।

খ) ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণের সময় মূল শব্দের S স্থানে 'স' Sh স্থানে 'শ' এবং St স্থানে 'স্ট' ব্যবহৃত হয়। যেমন– ইংরেজি sofa, soapকে বাংলা লিখতে হবে সোফা, সোপ; ইংরেজি Shop, Shine-কে বাংলায় লিখতে হবে সপ, শাইন রূপে, ইংরেজি Post, Station, Master, Restaurant-কে বাংলায় লিখতে হবে পোস্ট, স্টেশন, মাস্টার, রেস্টুরেন্ট। কোনভাবেই পোষ্ট, ষ্টেশন, রেষ্টুরেন্ট নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. নিচের প্রতিটি শব্দের শুদ্ধ বানান পাশের খালি জায়গায় লিখুন ঃ

কৃষক ---------- নিারন্দ ---------- বিশেষণ ----------

পরিষীসা ---------- বিষর্গ ----------, পোষাক ----------

জিজ্ঞাষা ---------- মহিস ---------- সুসমা ----------

বিস্ফোরণ ----------, অভিলাস ---------- শোড়স ----------

২. ষ-ত্ব বিধানের ব্যতিক্রম ঘটেছে এমন পাঁচটি শব্দ নিচের খালি জায়গায় লিখুন

----------, ----------, ----------

----------, ----------, ---------- ।

৩. স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ হয় এমন শব্দগুলোর তালিকা প্রদান করুন।

৪. ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণের নিয়মগুলো লিখুন।

৫. নিম্ন লিখিত বিদেশী শব্দগুলোর নিচে বাংলা প্রতিবর্ণীকৃত রূপ লিখুন।

Steamer, Steel, Show, Photostat, Post master, Station, August.

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১. বিধান কাকে বলে? ণ-ত্ব বিধান বাংলা শব্দ সম্ভারের মধ্যেকার কোন ধরনের শব্দের বেলায় প্রযুক্ত হয়?

২. বিধানের নিয়মগুলো লিখুন।

৩. বিধানের ব্যতিক্রমগুলো নির্দেশ করুন।

৪. বিধান কাকে বলে?

৫. বিধানের ব্যতিক্রমগুলো নির্দেশ করুন।

৬. বাংলা ভাষায় ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধানের প্রয়োজনীয়তা কী?

পাঠগুলোর সাহায্য নিয়ে চূড়ান্ত মূল্যায়নের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর নিজে নিজে তৈরি করুন।